বিষয় উপস্থাপনাঃ- গৌতম সরকার

সহঃকারি অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ,

এস,আর,ফতেপুরিয়া কলেজ

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনঃ-

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের অর্থনৈতিক,সামাজিক,রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভুমিঃ

বিষয় সংক্ষিপ্তসারঃ-

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নূতন অনুসন্ধান ও সংস্কারের দ্বারা চিনহিত হয়েছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে এই নূতন অনুসন্ধানস্পৃহা বৈদিক যুগের শেষ দিকে উপনিষদে প্রতিফলিত হয়েছিল। উপনিষদ বৈদিক ধর্ম এবং জীবনযাপন-পদ্ধতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে, তত্বগত দিক থেকে তাঁদের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সেখানে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। ইতিহাসে পরিব্রাজক এবং শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী এই নূতন চিন্তার অগ্রদুত ছিলেন।এই সন্ন্যাসীরা বা শ্রমণেরা সংসার ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেদের অধিকার ও তাঁর উপর প্রতিষ্টিত সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্টানকে অস্বীকার করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্টিত বর্ণভেদ ব্যবস্থাও তাঁরা মানেননি। মানুষের জীবনে স্বর্গীয় দাক্ষিণ্যের উপযোগিতাও তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন। এই পর্বেই ভারতীয়গণ উপজাতি জীবন অতিক্রম করে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল। অর্থনীতিতে পশুপালন পর্বের পর কৃষিভিত্তিক জীবন শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি নগর গড়ে ওঠায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতেই সমগ্র মানুষের মুক্তির পথ রূপে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল প্রতিবাদী ধর্মগুলির।

অর্থনৈতিক পটভূমিঃ

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশে এবং দক্ষিণ বিহারে যথাক্রমে কোশল এবং মগধে। প্রচলিত ধারণা হল যে বৈদিক ধর্মের যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান এবং কঠোর বর্নাশ্রম প্রথা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তির মূল কারণ। বৈদিক ধর্মের পীঠস্তান ছিল পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তিস্থল হল পূর্বভারত, উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণ বিহারে। এই অসামঞ্জস্য থেকে অধ্যাপক রামশরন শর্মা মন্তব্য করেন যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তির কারণ খুঁজতে হলে সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জানতে হবে। অধ্যাপক শর্মার মতে কৃষিকার্য ও শিল্পে লোহার ব্যবহার পূর্বভারতের অর্থনীতিতে যে বিরাট পরিবর্তন

নিয়ে আসে তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি ধর্মের উৎপত্তির কারণ খুঁজতে হবে। অনুমান করা হয় যে খ্রিষ্ট পূর্ব এক হাজার অব্দে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে, দক্ষিণ বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে ৭০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। কৃষিকার্যে লোহার ব্যবহার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ সপ্তম শতকের আগে ঘটেনি বলে অনুমান করা হয়। এরপর থেকে ৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে লোহার ব্যাপক ব্যবহার চলতে থাকে। লৌহ-ফলাকাযুক্ত লাঙলের ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রের এলাকা যেমন বৃদ্ধি করে, গভীর বা নিবিড় চাষও তেমনই সম্ভম হয় এবং যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এই নতুন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নতির সঙ্গে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রাক-লৌহযুগে কৃষি উৎপাদনে গরুর বিশেষ ভুমিকা ছিল না। ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানুভাব দেখা দিয়েছিল। এই যুগে গরু খাদ্য হিসাবে বা দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হত। যজ্ঞানুস্থানে পশুবলির যে রীতি ছিল তার ফলে গো-সম্পদ নষ্ট হতে বসেছিল। খাদ্য হিসাবে এবং বলি হিসাবে গো-সম্পদের অপচয়ের উল্লেখ আছে শতপত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ' মঝঝিমনিকায় ', ' সুত্তনিপাত ' প্রভৃতি গ্রন্থে। নতুন কৃষি-পদ্ধতিতে গোপালন একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্তনিপাতে কৃষিকার্যকে গোপালন থেকে অভিন্ন বলা হয়েছে। সুতরাং প্রাক-লৌহযুগে অর্থনীতিতে গো-সম্পদের গুরুত্ব না থাকলেও লৌহ প্রযুক্তির যুগে কৃষিকার্যে গোরুর প্রয়োজনীয়তা এই দুই পদ্ধতির মধ্যে একটি সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। ধর্মীও কারনে গো-হত্যা অনুমোদিত হবার ফলে এই সংঘর্ষ ধর্মীও স্তরেও দেখা দেয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে বারবার যেসব কথা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে সমসাময়িক অর্থনৈতিক চাহিদা সম্পর্কে বৌদ্ধরা অনেক বেশী সচেতন ছিল। নতুন কৃষি পদ্ধতির বিকাশের পথে যে সব অন্তরায় ছিল তারা সেগুলির নিন্দা করেছেন। বৌদ্ধ নিকায় গ্রন্থে একটি কাহিনী আছে যে, কোন এক রাজা যজ্ঞের জন্য পশু হত্যার আয়োজন করলে বুদ্ধদেব তার কঠোর নিন্দা করেন। বুদ্ধদেব একসময় বলেছিলেন যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা গোহত্যার বিরোধী ছিলেন, কারণ, গরু মানুষের অত্যন্ত আপনজন এবং তার সাহায্যেই শস্য উৎপাদিত হয়। মঝঝিমনিকায় গ্রন্থে গৃহপতি এবং কুলপতিদের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা যায় যে গোপালন তাদের প্রধান কর্তব্য। গোপালকের কয়েকটি গুনের উল্লেখ আছে মঝঝিমনিকায় গ্রন্থে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের খাদ্য ও ধর্মীও কারনে পশুহত্যার যে নিন্দা করা হয় তার তাৎপর্য হল যে নতুন কৃষি পদ্ধতিতে গরু অপরিহার্য ছিল।

কৃষিকার্যে লৌহ-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমান এত বেশি পরিমানে বৃদ্ধি পায় যে এই সম্পদের ওপর নির্ভর করে রাজারা বড় বড় রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। রাজা স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নগরজীবন দ্রুত সম্পসারিত হয়, ফলে বণিক, কারিগর, শিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ যারা ব্যস্ত থাকত না, তাদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, তার প্রকাশ ঘটে নগরজীবনের প্রসারে। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে ১০টি নগরের উল্লেখ আছে , সেগুলির মধ্যে ৬টি নগর বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পুরাতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে চম্পা , রাজগৃহ , পাটলিপুত্র , বৈশালী , বারানসী , কুশীনগর , শ্রাবস্তি প্রভৃতি নগরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। বাণিজ্যের প্রসার নগর সৃষ্টিতে সাহায্য করে, নগরগুলিও বাণিজ্য প্রসারে সাহায্য করে এবং ফলে নাগরিক জীবনের সুত্রপাত ঘটে যার অস্তিত্ব বৈদিক যুগে ছিল না বললেই হয়। এই যুগে খোদিত মুদ্রার প্রচলন হয় (Punched Marked Coins), ফলে সম্পদ সঞ্চয় করবার মাধ্যমের উদ্ভব ঘটে। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দেখা দেয়। সংক্ষেপে কৃষি উৎপাদনের বিস্তার, বাণিজ্যের প্রসার, নগরজীবনের উদ্ভব, মুদ্রার প্রচলন এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের তীব্রতা বৃদ্ধি যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা সৃষ্টি করে তাঁরই ফলশ্রুতি হিসাবে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে।

সামাজিক পটভূমিঃ-

কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক বৈদিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নগরজীবনের কোন গুরুত্ব ছিল না। সামাজিক উদ্‌বৃত্তের পরিমান বৃদ্ধি পেলেই নগরজীবনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা নগরজীবনের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের বিরোধী ছিলেন। প্রথমতঃ বণিকদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব ভাল ছিল না। বর্ণাশ্রম প্রথাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সমাজের মধ্যমণি। সমাজে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত হলেও স্বাবাভিকভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষোভ ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল যদিও সম্পদের মালিক হিসাবে তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক সম্পদশালী ছিল। বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা ধর্মশাস্ত্রগুলি সমর্থন করেনি। বৈধায়ন নামে এক শাস্ত্রকার অঙ্গ এবং মগধের অধিবাসীদের 'ব্রাত্য' বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তারা ব্যবসা-বানিজ্যে লিপ্ত ছিল এবং সামুদ্রিক বানিজ্যে আগ্রহী ছিল। বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, চামড়া, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসাকরা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্মে এই বনিকশ্রেনী বিশেষ মর্যাদা পায়, এরা অধিকাংশই ছিলেন বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। বৈশ্যরা ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা ধন অর্জন করলেও ব্রাম্মন-শাসিত সমাজে তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত ছিল। বুদ্ধদেব এই শ্রেণীর সামাজিক ক্ষোভ প্রশমন করেন। বুদ্ধের আদি শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রাবস্তির একজন ধনী অনাথপিন্ডত শ্রাবস্তিতে একটি বৃহৎ উদ্যানই বুদ্ধদেবকে দান করছিলেন।

ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে অর্থের লেনদেন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই লেনদেনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল ঋণের জন্য সুদ গ্রহণ। ব্রাহ্মণদের পক্ষে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এটিকে শাস্ত্রবিরোধী বলা হত। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে সুদ গ্রহন নিষিদ্ধ ছিল না , বরঞ্চ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উচিৎ ঋণ শোধ করা। অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে বনিকের জীবনযাত্রা প্রণালীকে আদর্শ বলে তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাণিজ্যে ঋণদান , সুদ গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। বুদ্ধদেব এগুলিকে স্বীকৃতি দান করে একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করেন। নগরজীবনের কতগুলি অপরিহার্য বিশেষত্ব ছিল যেগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মেনে নিতে পারেননি, যেমন নিম্নবর্ণের ব্যক্তির কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করা। পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাবার ফলে এক ধরনের অসহায় নারীর সৃষ্টি হয় যারা এই নগরগুলিতে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে। বুদ্ধ নগরজীবনের এই বৈশিষ্ট্যও মেনে নেয়। তিনি বৈশালীর বিখ্যাত গণিকা আম্রপালির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং এই শ্রেণীর নারীদের বৌদ্ধ সঙেঘ যোগদানের অধিকার দান করে তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি দেন। উদারতা এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এই ধর্মমত যুগোপযোগী ছিল।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি প্রচণ্ড সংঘাত চলে আসছিল। লোহার ব্যবহারের ফলে ক্ষত্রিয়রা উন্নতধরনের অস্ত্রের অধিকারী হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর ব্রাহ্মণদের প্রভুত্বের বিরোধিতা করতে থাকে। বৌদ্ধ্যগ্রন্থগুলিতে ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং মহাবীর ক্ষত্রিয় ছিলেন। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে কৃষকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁদের প্রধান কর্তব্য হল ক্ষত্রিয়দের কর দেওয়া, কেননা ক্ষত্রিয়রা নৈরাজ্যের হাত থেকে রাষ্ট্র তথা জনসাধারণকে রক্ষা করেন। এর ফলে কৃষিক্ষেত্র গুলিও রক্ষা পায়। নিয়মিত রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং বুদ্ধদেবের মতে ঠিকমত রাজস্ব দেওয়া প্রজাদের কর্তব্য। এর দ্বারা বুদ্ধদেব তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।

বোইদিকযুগে গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে গেলে সাধারণ মানুষ যে নৈরাশ্য এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম সেই পরিস্থিতি থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করে একটি বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপন করে। কৃষিকার্যের বিস্তার, সামাজিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, মুদ্রার প্রচলন এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে তীব্র সংঘাত দেখা দিয়েছিলো তা থেকে মানুষকে বাঁচবার পথ বৌদ্ধ ধর্ম দেখাতে সক্ষম হয়। এমনকি মানুষকে পার্থিব দুঃখ থেকে চরম মুক্তির পথও তিনি নির্দেশ করেন। তিনি মানুষকে নির্বাণের আশ্বাস দেন। যারা গৃহত্যাগ করে শ্রমন হবেন না, তারাও বৌদ্ধসংঘে যোগদান করে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বুদ্ধের এই সমাধান কার্যকর করতে হলে

সমাজকে একটি মুল্য দিতে হবে। সেই মুল্য হল শ্রমণদের ভিক্ষাদান করা। আসলে কৃষিকার্য ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শ্রেনীবিভক্ত সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয় ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য বুদ্ধদেব পথনির্দেশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সামাজিক বিপ্লবসাধন ছিল না, তিনি ছিলেন সংস্কারক এবং আচার্য।

ধর্মীয় পটভূমিঃ-

বৈদিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের ক্ষেত্রে। ধর্মীয় বলিদানের ধারণা পরবর্তী বৈদিক যুগে শক্তিশালী হয়। বৈদিক ধর্ম একদিন আর্যসমাজে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। প্রথমদিকে এ ধর্মের সরলতা প্রত্যেক আর্য সন্তানের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বৈদিক ধর্ম কালক্রমে তাঁর সরলতা হারায় এবং যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপে খুবই জটিল হয়ে পড়ে। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক আবেদন অপেক্ষা বড় হয়ে ওঠে। ধর্মাচরণে জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হাতে যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠান সম্পাদনের অধিকার একচেটিয়া হয়ে যায়। গৃহস্থের পুণ্যলাভ অথবা পাপ-স্খালনের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অধিকার ব্রাহ্মণদের হাতে গিয়ে পড়ে। ব্রাম্মনশ্রেনীর এই প্রাধান্য সমাজে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের অসন্তোষ বৈদিক যুগের শেষভাগে তীব্র আকার ধারন করে। অনেকে মনে করেন উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থক ছিল ক্ষত্রিয়রা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পূর্বভারতে খুব একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে সব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছিলো, সেগুলির উৎসস্থল ছিল পূর্ব ভারতে আর ক্ষত্রিয় শ্রেণীর লোকই এগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলো।

যাগযজ্ঞ ও পশুবলির নিষ্টুর প্রথা এবং সমাজে নিচু শ্রেণীর প্রতি উঁচু শ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঘৃনা এই দুটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইসব প্রতিক্রিয়ার মুখ্য আক্রমণ গিয়ে পড়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে। কারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মই সেদিন এসব অন্যায়ের পৃষ্টপোষকতা করেছিল। উপনিষদের ঋষিরা যে স্বাধীন ধর্মচিন্তার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেই চেতনাকে স্তব্দ করে দিতে চেয়েছিল। এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বৈদিক যুগের শেষে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম –বিরোধী (বেদবিরধী) নানা মতের উদ্ভব ঘটে। এইসব ধর্মমতের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল সর্বাপ্রেক্ষা বেশী।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকের আগে থেকেই ভারতবর্ষে তিনটি চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, যজ্ঞের ওপর অগাধ বিশ্বাস, যার মাধ্যমে যে মন কাম্যবস্তু মানুষ লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব এবং আত্মাই একমাত্র সত্য বা নিত্য- উপনিষদের এই বাণীর প্রতি চরম আস্থা। তৃতীয়তঃ, সনাতন ও শাশ্বত নিয়মে অবিশ্বাস। কোন ঘটনার উৎপত্তি বিশ্লেষণে আকস্মিকতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। একদিকে যাগযজ্ঞের ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, অপরদিকে ব্রহ্মই সত্য- এই অদ্বৈতবাদের বিকাশের ফলে ব্যক্তি মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাঁরা এমন একটি ধর্মের অপেক্ষায় ছিল যাতে তাঁরা মুক্তির আস্বাদ পায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম মানুষের মুক্তির পথের নির্দেশ দেবার চেষ্টা করে। স্বভাবতই এ দুটি ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল।

উপনিষদের ঋষিরা ধর্মীয় যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করতে পারেন নি। ধর্মীয় বিচারে এগুলি মূল্যহীন বলে তাঁরা মনে করতেন। উপনিশদগুলিতে কোন নির্দিষ্ট দেবতার কথা নেই। উপনিষদগুলির আদর্শ পুরুষ হলেন সেই ভবিষ্যৎ স্রষ্টা যিনি জাগতিক কোন ব্যাপারে মাথা ঘামান না, এমনকি ধর্মের ব্যাপারেও তিনি নির্বিকার। তিনি দেবতাদেরও ওপরে এবং তিনি ব্রহ্মের মতই চিরন্তন ও অবিনাশী।

উপনিষদগুলিতে শাণ্ডিল্য, যাগযজ্ঞ ও উদ্দালক নামে তিনজন ঋষির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুজন হলেন ভাববাদী এবং শেষজন বাস্তববাদী ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন। উদ্দালক চতুর্বেদের সুক্তগুলির বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেন এবং বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে দেবতাদের কোন ভূমিকা নেই বলে মন্তব্য করেন। এমনকি তিনি আত্মন-এর

ধারনাটিও স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আত্মন হল প্রাথমিক বস্তুগত মানবিক ভিত্তি। অতএব দেখা যায় যে উপনিষদগুলিতে যে ধ্যানধারণার সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থন করা হয়নি। অর্থাৎ উপনিষদগুলিতেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুষ্ঠান সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপের বিরধীতা করা হয়। অবশ্য উপনিষদগুলি বেদ অস্বীকার করেনি। উপনিষদের সময় থেকেই সন্ন্যাসী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সন্নাসীরা তৎকালীন সামাজীক বন্ধন ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হন। এদের বলা হয় পরিব্রাজক (তীর্থযাত্রী) বা শ্রমণ।এরা প্রথমদিকে মঠ বা সম্প্রদায় গড়ে তোলেন নি। পরে অবশ্য তাঁরা নিজ নিজ মঠ বা সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়গুলি বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিল সত্য, কিন্তু কোন বিশেষ ধরণের সামাজিক কর্মসূচী ঘোষণা করেনি। অজীবিকগণ এরূপ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায়। গোসাল ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ব্রাহ্মণদের রক্ষনাধীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদই করেননি, তিনি তাঁর মতবাদ যাতে সমাজের অব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে আকর্ষণযোগ্য হয় তাঁর জন্যও সচেষ্ট হন। গোসাল তাঁর ধর্মপ্রচার কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি, গৃহীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বহুসংখ্যক গৃহী তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করলেও দৈনন্দিন জীবনে আগের মতোই প্রচলিত পূজাপার্বণ মেনে চলতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব থেকেই যায়। আজিবিক ধর্মের বা সম্প্রদায়ের মতো আর একটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন অজিতা কেশকম্বলিন। তিনি বলতেন আত্মা বলে কিছু নেই এবং মানুষের মৃত্যুর পর সবকিছুই শূন্যে মিলিয়ে যায়। পুরানকাশ্যপ নামে এক ধর্মগুরুও প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাব খুবই কঠোর ছিল। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে গৌতম বুদ্ধ যখন ধর্ম প্রচার শুরু করেন সে-সময় উত্তর ভারতেই ৬৩টি ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এসব ধর্মের প্রভাব দূর করবার জন্য প্রয়োজন হয় আরো শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলনের। পণ্ডিত অলদেনবারগের কথায় , গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের শত শত বছর আগেই ভারতীয়দের চিন্তাধারায় এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল যা বৌদ্ধধর্মের পথ সুগম করে।

রাজনৈতিক পটভূমিঃ-

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চমকপ্রদ নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই সময়েই ভারতে প্রথম অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে এবং তারপর সেগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির সাক্ষ্যপ্রমানের ভিত্তিতে বলা যায় যে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি ভারতে ১৬টি বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে ভারতের সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। আসলে ভারতে তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৬টির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ১৬ সংখ্যাটি দিয়ে এটাই বোঝান হয়েছে যে অসংখ্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৬টি রাষ্ট্রই ছিল উল্লেখ করার মতো।

বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ' অঙ্গুত্তরনিকায় ' এবং জৈনশাস্ত্র ' ভগবতীসুত্ত ' নামে দুটি গ্রন্থ থেকে আমরা ১৬টি রাষ্ট্র সম্বন্ধে জানতে পারি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধ ' অঙ্গুত্তরনিকায় ' গ্রন্থে এই রাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অধিক নির্ভরযোগ্য। এই ১৬টি রাজ্য হল ১) কাশী ২) কোশল ৩) অঙ্গ ৪) মগধ ৫) বজ্জি বা বৃজি ৬) বৎস ৭) মল্ল ৮) চেদী ৯) কুরু ১০) পাঞ্চাল ১১) অস্মক ১২) শূরসেন ১৩) কম্বজ ১৪) অবন্তী ১৫) মৎস্য ১৬) গান্ধার।

ষোলটি রাজ্য ছাড়াও এ যুগে কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল। এগুলিতে বিভিন্ন উপজাতি বা গোষ্ঠীর শাসনের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা, পিপ্পলিবনের মোরীয়, কেশপুরের কালামা জাতি, আল্লকপ্পার বুলি জাতি, কপিলাবস্তুর শাক্য জাতি, মিথিলার বিধেহ জাতি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত রাজ্যগুলির অবস্থান দেখে অনুমান করা যায় যে , গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা অঞ্চলই সেদিনের আর্যাবর্তের প্রাণকেন্দ্র ছিল। একমাত্র অস্মক রাজ্যটি ছিল দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী অঞ্চলে। দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিমের সুদৃঢ় অঞ্চল্গুলি ষোড়শ মহাজনপদের সময়ে আর্য সভ্যতার বাইরে ছিল। পূর্বদিকের কামরূপ ও বঙ্গদেশ ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে তখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেনি।

ষোড়শ মহাজনপদের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। অবশ্য এই যুদ্ধবিগ্রহের পিছনে বড় রাজ্যগুলির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই ছিল প্রধান। কিছুদিনের মধ্যেই দুর্বল রাস্ত্রগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। ফলে চারটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়- মগধ, কোশল, অবন্তী ও বৎস। মগধ রাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, অবন্তিরাজ প্রদ্যোত এবং উদয়ন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগে প্রাধান্য লাভ করেন। সবশেষে মগধ রাজ্য আর্যাবর্তের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

ষোড়শ মহাজনপদের যুগে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুরকম প্রচলিত শাসনব্যাবস্থা ছিল। অনেক রাজাই এ যুগে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। রাজাদের মধ্যে ' সম্রাট', 'একরাট' প্রভৃতি উপাধিধারী রাজারও দেখা পাওয়া যায়। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজা একছত্র ক্ষমতার অধিকারী হলেও স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। ব্রাহ্মণ পুরহিতদের পরামর্শ, প্রতিনিধি সভার গুরুত্ব এবং পুরাতন রীতিনীতি তাকে মেনে চলতে হতো। এই যুগে বিভিন্ন গণরাজ্যও গড়ে ওঠে। এইসব রাজ্যে গণতন্ত্রের এক অভিনব পরীক্ষা চলছিল। এইসব রাজ্যের শাসনকার্য উপজাতিদের সমিতি দ্বারা পরিচালিত হত। প্রতি গ্রামে জনসাধারণের নির্বাচিত সমিতি ছিল। আবার অনেকগুলি গণরাজ্যে প্রধানের পদ পুরুষানুক্রমিক ছিল। বৈশালী নামক গণরাজ্যে একজন রাজা, একজন উপরাজা ও একজন সেনাপতির ওপর রাজ্য শাসনের দ্বায়িত্ব ছিল।

গণরাজ্যগুলি গঠিত হয়েছিল কখনো একটি উপরাজ্য নিয়ে, যেমন শাক্য-মল্ল। আবার একাধিক উপজাতি নিয়ে, যেমন বৃজি ও যাদব। ভারতে আর্যরা প্রথমে গণরাজ্যই স্থাপন করে, পরে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আবার রাজশক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন স্বাধীনচেতা আর্যরা বনজঙ্গল পরিস্কার করে সেখানকার উপজাতি বা আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে একজোট হয়ে নতুন গণরাজ্য গড়ে তোলে। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এরূপ গণরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। রাজ্যশাসনের যৌথ ব্যবস্থাই ছিল গণরাজ্যগুলির প্রধান শক্তি। বিভিন্ন উপজাতিদের প্রতিনিধিরা বা পরিবারের কর্তারা নিয়মিত প্রতিনিধি সভায় মিলিত হত। প্রতিনিধি সভার সভাপতিকে রাজা বলা হত। তবে এই পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। অতএব তাকে রাজা না বলে প্রধান বলাই যুক্তিযুক্ত। সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রাহ্য হত। গণরাজ্যের শাসনকার্য চালাবার জন্য বিভিন্ন কর্মচারী ছিল। অনেকের মতে বুদ্ধদেব গণরাজ্যগুলির ধাঁচে সংঘ গড়ে তুলেছিলেন।

বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েই গণরাজ্যের নাগরিক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বিশেষ বিশেষ উপজাতির সদস্যও ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শাক্য উপজাতির আর মহাবীর ছিলেন জ্ঞাতৃক উপজাতির সদস্য। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণরাজ্যগুলির উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।এইসব গণরাজ্যগুলিতে শাসকশ্রেণী ছিল ক্ষত্রিয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের হাতেই ছিল। ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। এ কারনে বৌদ্ধশাস্ত্রে সমাজে ক্ষত্রিয়দের স্থান ব্রাহ্মণদের ওপরে দেওয়া হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ-

1) Genesis of Buddhism-Its Social Content- B.N.Mukherjee.

2) Political History of Ancient India-H.C.Raychowdhury.

3) Religions of Ancient India- L. Renou.

4) The Religion and Philosophy of the Vedas and Uponisads- A. B. Keith.

৫) অতীতের উজ্জ্বল ভারত- এ, এল, ব্যাসাম।

৬) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(প্রথম খণ্ড)- সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

৭) ভারতবর্ষের ইতিহাস- রোমিলা থাপার।

সম্ভাব্য প্রশ্নগুলিঃ-

১) পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক বিভাগের ভিত্তি কি ছিল? (২)

২) খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকে ধর্মান্দোলনের ফলে কতগুলো ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছিল? (২)

৩) দ্বিজ কাদের বলা হয়? (২)

৪) খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকের ধর্মান্দোলনে ক্ষত্রিয়রা নেতৃত্ব দিয়েছিলো কেন? (৫, ১০)

৫) বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের আরথ-সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ কর ? (১০)

৬) বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকা আলোচনা কর। (১০)